মন্থরোর মা অথবা রাজধানীর গল্প

মন্থরোর মা লাঠি ঠুকে ঠুকে এসে আমাদের বারান্দায় বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কলকেতা থেকে নাতি আসবে বলেছেল, এলোনি, ইদিকে সাঁঝ নাগতে নেগেছে, ভাবলুম পাখি কটা তবে খোকাকেই দে'আসি। দাও বাবা, চার আনা পয়সা দাও।

বলে চারটে তিতির পাখি আমার সামনে নামিয়ে রেখে মন্থরোর মা হাত পাতল। পাখিগুলির একটার সঙ্গে আরেকটার পা সুতলি দিয়ে বাঁধা, সেই অবস্থায় তারা ডানা ফরফর করে মাঝে মাঝে ওড়ার চেষ্টা করছে, হাঁপিয়ে গিয়ে দম নেবার চেষ্টায় তাদের ছোট্ট পেট ফুলে ফুলে উঠছে।

আমি বেশ মুশকিলে পড়লাম। একে তো, মন্থরোর মা জানে না, বেশ কিছুদিন হল আমি আমিষ ছেড়ে দিয়েছি। তার ওপর যদিবা তিতিরগুলো কিনে নিয়ে পরে উড়িয়েও দিই, তার দাম মাত্র চার আনা?

জোর করে বেশি দাম দিতে গেলে সে কিছুতেই নেবে না। বোঝাতে গেলে বা বেশি জোর করলে সে এই বলে কাঁদতে বসবে— খোকাও আমায় ভিখিরি ভাবলি বাবা! এ আমি আগেও অনেকবার দেখেছি। বছর কয়েক আগে, যে-বছর ইন্দিরা গান্ধি নিহত হলেন, দিল্লি একেবারে অসহ্য লাগাতে সপ্তাহ কয়েকের ছুটি নিয়ে গ্রামে এসেছি, মন্থরোর মা দুটো নারকেল নিয়ে এসে এক টাকা চাইল। বাজারে দুটো নারকেলের দাম তখনই সাত-আট টাকার কম নয়, কিন্তু সেকথা বোঝায় কে! শেষ পর্যন্ত তাকে সাহস করে একটা দু টাকার নোট দিলাম। চোখে তো প্রায় দ্যাখেই না, একটাকা আর দু-টাকার নোটে নিশ্চয়ই তফাত করতে পারবে না। মন্থরোর মা নোটটার ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে প্রথমে তার ধারগুলো ও পরে জমি ও তারপরে দুটোই একসঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল— তুমিও আমায় ভিখিরি ভাবলে বাবা! তোর দরজায় আমি কি ভিখিরি এয়েছি, খোকা!

আমার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে মন্থরোর মা অধৈর্য হয়ে বলল, দাও বাবা, চার আনা পয়সার জন্যি আর বোস থাকতি পারি না। অ্যাতটা আস্তা, ঘরে ফিরতি আত হয়ে যাবে।

আমি একটু নির্দয় হয়ে বললুম, মাছ-মাংস আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদিমা।

আমি যখন এই বাড়িতে হামাগুড়ি দিই তখন থেকেই (পরে শুনেছি, তারও আগে থেকে) মন্থরোর মা আমাদের বাড়িতে ডিম, দুধ, নারকেল এইসব দিয়ে যেত। কথা বলতে শিখে মন্থরোর মাকে আমি দাদিমা বলে ডাকতাম। আমার মা কিংবা বাবাই শিখিয়েছিলেন।

— তুমি কি নিমাই সন্নিসি হবে নাকি? কচি বয়েস, মাংস না খেলি চলে? এখনও বে-শাদিও করলে নি!

একথায় আমার সত্যিই হাসি পেয়ে গেল। চাকরি করে মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে এসেছে, বছর পাঁচেক পরে রিটায়ার করব— কচিই বটে! বে-শাদির বয়েসই বটে!

আসলে মন্থরোর মার সঙ্গে আজকাল আমার বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় না। থাকি দিল্লিতে, কালে-ভদ্রে ছুটি নিয়ে দু-চার দিন আসি, এবার একটু ঘন ঘন এলাম। তার কারণ, রিটায়ার করে শেষ অব্দি হয়তো এখানে এসেই থিতু হব। ছোটবেলা থেকেই গাছপালা আর লেখাপড়ার শখ, ওই দুটো নিয়ে থাকার ইচ্ছে। সেইভাবে এই বাড়িটা কোনদিকে কতটা অদল-বদল করা যায়, কিছুদিন ধরে নানাভাবে ভাবছি।

— কই বাবা?

অগত্যা ঘর থেকে একটা সিকি এনে মন্থরোর মার হাতে দিয়ে বললাম, তোমার কাজকম্ম কেমন চলছে, দাদিমা?

মন্থরোর মা সিকিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে সামনের দিকে বৃথা খানিক চেয়ে থেকে বলল, দিন আর কাটে না বাবা। ওজ সূয্যি উঠতিছে, ওজ সূয্যি ডুবতিছে, কিন্তু মনি হয় ঝ্যানো সূয্যি উঠতিছেও না, ডুবতিছেও না।

মন্থরোর মার আসল নাম কী কেউ জানে না। আদপেই তার কোনও নাম আছে বা ছিল কিনা, জানার দরকারই হয় না। এ বিষয়ে কেউ কখনও কিছু ভাবেও না। পাড়ার কেউ মন্থরোর মার উঠোনে দাঁড়িয়ে মন্থরোকেই জিজ্ঞেস করে, মন্থরোর মা মাঠ থেকে ফিরেছে রে, মন্থরো?

দাঁত খোঁটা মন্থরোর আযৌবন অভ্যেস, দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সেও জবাব দেবে, মন্থরোর মা কি তোমার ঝ্যামন-ত্যামন বংশের মেয়েছেলে নাকি গো, বেলা তিনটেতেও মাঠে-ঘাটে ঘুরে মরবে? কী, বিছের ওষুধ নিতে এয়েছো, না কাছিমের ডিম?

বা হয়তো বলে (বিশেষ করে সন্ধেবেলা কেউ এসে ডাকলে), মন্থরোর মা কি তোমার জন্যি ডুমুরের মধু নিয়ে বসে ওয়েছে যে অ্যাগবারে হত্যে দিয়ে পড়লে?

শুধু মন্থরোই না, মন্থরোর মাও তার আব্বাকে লতায়-পাতায় মুর্শিদাবাদের নবাবের বংশধর বলে বিশ্বাস করে।

মন্থরোর মা'র আব্বা ভাতের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের পৈতৃক ভিটে আর পিতৃপুরুষের কবরের মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বারুইপুরের এই পশ্চিম সীমানায় এসে যখন ডেরা বাঁধে তখন এখানকার এইসব গ্রামে ছিল বলতে শুধু বন-জঙ্গল। জঙ্গলের শেষে জলা। মন্থরোর মা'র আব্বা জঙ্গল কেটে প্রথমে নিজের চাষ-বাস ও পরে ক্রমশ আরও পাঁচজনের চাষ-বাসের ব্যবস্থা করে। তার শাদিও হয় এই নতুন বসতি করা ঘরের মেয়ের সঙ্গে। মাটিও নিল এখানেই। তারপর মন্থরোর মা'র শাদি হল, সেও এই গাঁয়েরই ছেলের সঙ্গে। বছর চোদ্দ-পনেরো পরে সে-মানুষটাও মরে গেল। মন্থরোর মা'র ছোট মেয়ে তখন পেটে। সেই থেকে মন্থরোর মা-ই সংসার চালায়। সেই মেয়ের শাদি হল যেবারে, তখনও বারুইপুরে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন হয়নি। বছর কয়েক পর তার তালাকের সময় সবে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের তার খাটানোর কাজ শুরু হয়েছে। তখনও এখানকার প্রবীণ হিন্দুরা বলাবলি করত, পশ্চিমের শুকনো খালটা আসলে আদিগঙ্গা। ভেলায় সাপে-কাটা লখিন্দরের শব নিয়ে বেউলা এখান দ্যেই গেছিল।

ডুমুরের মধু মানে অবশ্য চোলাই মদ। মন্থরোর মা নিজে চোলাই করে না, শুধু ছাপ্লাই দেয়।

তা সেই এক-দেড় কুড়ি বয়েস থেকে আজ এই চার কুড়ি পেরনো বয়স অব্দি মন্থরোর মাকে করতে হয়নি এমন কাজ পৃথিবীতে বোধহয় বেশি নেই। তাছাড়া উপায় কী, বাপ-মরা অতগুলো ছানাপোনা নিয়ে বিধবা হওয়া— উদয়-অস্তে তা ধরো গে তোমার এক কুড়ি পেট। মজার কথা, মন্থরোও বুড়ো হত চলল, তবু আজও সে মাকে খাওয়ানো দূরের কথা, মা না হলে তাকেই আধপেটা খেয়ে থাকতে হত।

মন্থরোর নিজের চার ছেলে সেয়ানা হয়ে কে কোথায় ছিটকে-ছড়িয়ে গেছে মন্থরো জানে না। ছোট ছেলেটাও মাঝে মাঝে চলে যায়। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যোগাড় দেয়, জনমজুর খাটে, মাটি কাটে। তখন চুলে খুব তেল দিয়ে টেরি বাগায়। তারপর চুলে ধুলো পড়লে বাড়ি ফিরে আসে। তখন রোজ রোজ শাক ভাতে কি গুগলির ঝোলে বিরক্ত হয়ে কোনওদিন একমুঠো কাছিমের ডিম, কোনওদিন কয়েকটা পাখিটাখি খুঁজে আনে।

মন্থরোর ছেলেরাই শুধু নয়, মন্থরোর মার মেয়েদের ছেলেমেয়েরাও কে কোথায় আছে, কে কে বেঁচে আছে, কাদের শাদি হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে— এসব হিসাবও মন্থরোর মা'র ভারি গোলমাল হয়ে যায়। একটা সময় ছিল যখন আশপাশের দু-চার গাঁয়ের সিকিভাগ ছেলেমেয়েই মন্থরোর মা'র নাতিপুতি। তারাও বেশিরভাগ অন্তত বছরে কোনও না কোনও সময় মন্থরোর মা'র বাড়িতে এসে থেকে যেত। মন্থরোর ছেলেরাও তখন বাড়িতেই থাকত। মন্থরোর মা তখন লোকের বাড়ি-বাড়ি দুধ বেচত, ডিম বেচত, ছালা ভরা নারকেল বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত। তখনও যেটুকু জায়গা-জমি ছিল তাতে শশা ফলাত, বরবটি চিচিঙ্গা ফলাত। পালং মটর বুনত। কাজের তার শেষ ছিল না। তার কারণ মন্থরোর মা'র সারা জীবনে একটাই কাজ— যেভাবে হোক সংসারের দুটো ভাত যোগাড় করা।

কার্তিক মাস শেষ হতে চলল, সন্ধের মুখে এখনই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। মন্থরোর মা এই বয়েসে, এই কুয়াশায়, ঝাপসা অন্ধকারে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে যাচ্ছে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে রাস্তার হাত দুয়েক ওপরে প্রায় রাস্তার সমান্তরালে তার হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে